শামসুর রাহমানের *রৌদ্র করোটিতে* : নিবিড় পাঠ

তারানা নূপুর*

সারসংক্ষেপ : শামসুর রাহমান বহুপ্রজ অথচ পরিশীলনপ্রিয়, নান্দনিক বৈচিত্র্যে আস্থাবান অথচ স্বকীয়তায় ক্ষমাহীন, 'শব্দে শহীদ' এক নিঃসঙ্গ কবি-পুরুষ। *রৌদ্র করোটিতে* (১৯৬৩) তাঁর অনন্য প্রতিভার অন্যতম স্বাক্ষর। *রৌদ্র করোটিতে* অনবদ্য, কারণ এর ভাব, ভাষা ও ছন্দ এক সুরে ঐকিক। আশৈশব নাগরিক কবি শামসুর রাহমান এ কাব্যে শহর ঢাকার জীবনের অম্ল-মধুর, তীব্র-তীক্ষ্ণ, কুৎসিত-সুন্দরকে এক সখ্যে বেঁধেছেন নগরের দিনানুদৈনিক শব্দ-ভাষার তানে। এ কাব্যে কবির অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ সমান সক্রিয় — মনন, অভিজ্ঞতা ও প্রকাশের প্রয়াস সমান্তর। বিশ্ব কবিতার পঠন-পাঠন ও চেনা জগতের অভিজ্ঞানকে সমন্বিত করে কবি পরম যত্নে রচনা করেছেন *রৌদ্র করোটিতে*। ফলে, *রৌদ্র করোটিতে* বাংলাদেশের কাব্য হয়েও নান্দনিক যোগ্যতায় বৈশ্বিক। *রৌদ্র করোটিতে*-র নিবিড় পাঠই এই আলোচনার উদ্দেশ্য।

শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬) বাংলাদেশের ষাটের দশকের প্রধান কবি — যদিও কবিতাকে 'চারিদিকে চক দিয়ে এঁকে' দশক-বন্দি করার বিপক্ষে তিনি এবং কবিতাকে আকাশের মতো নিঃসীম ও বর্ণবিভাযুক্ত বলেই মনে করেন (শামসুর, ২০০৭ : ২২৪)। নান্দনিক অভিজ্ঞানে তিনি বৈশ্বিক ও আধুনিক অথচ কাব্য রচনায় নিজত্ব প্রত্যাশী। বিশ্ব-কবিতা আত্মস্থকরণে তিনি অগস্ত্য সমান। দান্তে থেকে শুরু করে পাশ্চাত্য কবিতার অধুনাতম ধারার কবিতার নন্দন-ভাবনাকে তাঁর কাব্য-অভিজ্ঞানে গ্রহণ-বর্জন-আত্তীকরণ এবং দৈশিক, নাগরিক দৈনন্দিন বাস্তবতার সাথে কবিতার শব্দ-ভাষা ও অভিপ্রায়কে মানানসই করে তুলে একটি নিজস্ব 'স্টাইল' নির্মাণের প্রয়াস শামসুর রাহমানের কবিতাকে এক অনন্য নিজস্বতা দান করে, যা বাংলাদেশের কবিতায় নতুন আভিজাত্য সঞ্চার করে — এ দেশের নাগরিক জীবনের শব্দ-ভাষা, ছন্দ-তান এবং জীবনোপলব্ধির মার্জিত ভঙ্গিটিকে প্রকাশ করে। *রৌদ্র করোটিতে* (১৯৬৩) শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কাব্য।

বাংলা কবিতায় শামসুর রাহমানের আবির্ভাব 'ল্যাজারসে'র পুনর্জীবনপ্রাপ্তির যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতার সাথে অবিচ্ছেদ্য —

> মনে হয় আমি যেন সেই লোকশ্রুত ল্যাজারস
> তিন দিন ছিলাম কবরে, মৃত-পুনরুজ্জীবনের
> মায়াস্পর্শে আবার এসেছি ফিরে পৃথিবীর রোদে
> ('প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে', *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*)

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রথম কাব্য *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগেতে* (১৯৬০) শামসুর রাহমান 'ল্যাজারসে'র মিথ-প্রতিমায় তাঁর নাগরিক বিবিক্তি প্রকাশ করেন। নগর ঢাকার বুকে এক জীবন্মৃত সত্তা নিয়ে নতুন কবি পর্যবেক্ষণ করেন তাঁর পরিপার্শ্ব, যদিও পোড়ো-হৃদয়ে লালন করেন 'রূপালি স্নানে'র রোমান্টিক স্বপ্ন। কাব্য রচনার শুরুতেই শামসুর রাহমান যে জীবন্মৃতের বোধে স্পৃষ্ট, তা এক আগন্তুক মানসিকতা। একজন 'আউটসাইডারে'র কাছে পৃথিবী আরামপ্রদ কোনো স্থান নয়। সে তার চারপাশে অনুভব করে প্রবল হৈ-চৈ। তার চোখে সমাজ-সংসার, ধর্মবিশ্বাস, সভ্যতা ও মানুষের সকল কর্ম অসংলগ্ন, যুক্তিহীন, ক্লান্তিকর ও পুনরাবৃত্তির নামান্তর। ফলে, 'আউটসাইডার' সমাজের মধ্যে বাস করেও সমাজ-বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ — তার জগৎ যন্ত্রণাময় অথচ সে সর্বদাই এক নতুন সত্য উন্মোচনে সক্রিয় থাকে। সে জগৎকে প্রত্যক্ষ করে গূঢ় ও গভীরভাবে — তার চেতন-অবচেতন, প্রজ্ঞা-স্বজ্ঞা, শরীর-মন ও শিল্পিতা দিয়ে অনুভব করতে চায় পৃথিবীর বাস্তব সত্যকে[১] (Wilson, 1963 : 12-13)। শামসুর রাহমান কাব্যরচনার শুরুতেই প্রভাবিত হয়েছিলেন কলিন উইলসন রচিত একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ *দি আউটসাইডার* দ্বারা (শামসুর, ১৯৯১: ১১৫), যেখানে লেখক ফ্রান্স কাফ্কা, আলব্যের কাম্যু, জাঁ পল সার্ত্রে, টি.এস.এলিয়ট, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, ফ্রেডরিক নিট্সে প্রমুখের রচনাকর্ম সমালোচনা করতে বিখ্যাত 'আউটসাইডার' তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকে এই নতুন অস্তিত্ববাদী ধারণা সাহিত্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কাব্য রচনার প্রথম পর্যায়েই শামসুর রাহমানের অন্তর্জগৎও মৃত্যুময় ও যন্ত্রণাদীর্ণ হয়ে উঠেছিল এই আগন্তুক মানসিকতায়। আর বাথেনের পথে-পথে 'ভাস্করের অসম্পূর্ণ মূর্তির মত' ঘুরে ফেরা ল্যাজারসের মরণাতীত বিষাক্ত অনুভবই সঞ্চারিত হয় নতুন পৃথিবীতে অভিযোজনে অপারগ আগন্তুক কবির চেতনায় —

> উল্লোল নগরে কত বিলোল উৎসব; কিন্তু তবু পারি না
> মেলাতে আপনাকে প্রমোদের মোহময়
> বিচিত্র বিকট স্বর্গে। বিষাক্ত ফুলের মতো কত।
> তন্ময় রহস্য জ্বলে ওঠে আজও দু'চোখে আমার।
> ('প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে', *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*)

সমাজের ভেতর থেকেও কবি একজন 'আউটসাইডারে'র মতো পৃথিবীকে নিরীক্ষণ করেন। ফলে, কবির কাছে চেনা পৃথিবীর রূপ-রঙ-রস, শ্রম-প্রজ্ঞা-প্রেম সব বিবর্ণ, বিস্বাদ, তমসাচ্ছন্ন মনে হয় — লোকালয়কে নরক আর জনগণকে বিকারগ্রস্ত নরকাত্মাদের মতো মনে হয়। এক পাণ্ডুর বোধে কবি সকল সময় আক্রান্ত — মৃত্যুর অধিক এক ভীষণ যন্ত্রণাময় চেতনার অধিকৃত, যা জীবনানন্দীয় বিপন্নতা আর বোদলেয়ারীয় বিবমিষাকে ছাড়িয়ে যায়। কবি বলেন — 'এ দৃশ্যের বোধ যাকে পায় সে কি মৃত্যু নয় তবে,/মৃত্যু নয়, মরণের অন্য মানে আছে ('প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে', *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*)। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত 'রুপালি স্নানে'র স্বপ্ন তাঁকে সেই অন্ধকূপ থেকে বেরিয়ে আসতে প্রেরণা যোগায়। ফলে, যে অসম্পূর্ণ ও অপ্রতিভ চেতনায় আরেক আগন্তুক, এলিয়টের 'প্রুফ্রক' বলে ওঠে — "I am Lazarus,

come from the dead,/come back to tell you all" (Eliot, 1936 : 6), সে চেতনায় উদভ্রান্ত নন ল্যাজারসরূপী শামসুর রাহমান। কারণ, এই ল্যাজারস সত্তা-সন্ধানী; প্রুফ্রকের মতো ফাঁপা মানব নন। এ ল্যাজারস প্রথম থেকেই সত্তায় 'অন্তহীন আশ্চর্য বিষাদ' নিয়ে ঘুরে বেড়ান ছন্দে ও মিলে কথা বানাবার গভীর বাসনায়। সত্তার এই দ্বৈততা থেকেই আস্তাবলের অন্ধকার, নোংরা নর্দমা, থ্যাঁতলানো ইঁদুর, ক্ষতগ্রস্ত বেতো ঘোড়া, অবদমিত-কাম মাতালের দল কিংবা কয়েকটি জোচ্চর অবলীলায় শামসুর রাহমানের কবিতার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যায় — আবার জাদুমন্ত্রে সে আস্তাবলই রূপান্তরিত হয় অপরূপ সরোবরে আর পরাবাস্তবতায় সওয়ার হয়ে 'বেতো ঘোড়া'টা নিঃসংকোচে উড়ে চলে আকাশে ('সেই ঘোড়াটা', *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*)। দ্বিতীয় কাব্য *রৌদ্র করোটিতে*'তে কবি মুক্ত হন তাঁর এ পর্বের চেতনার দ্বৈত স্বভাব থেকে। *রৌদ্র করোটিতে* থেকে শামসুর রাহমান অভিযোজিত হন নাগরিক জীবনবৈচিত্র্যের সাথে। এখানে কবি তাঁর একক বিপন্নতাকে ছোট-ছোট নানা বহিরাশ্রয়ে ছড়িয়ে দেন। কবি নাগরিক জীবনের দিনানুদৈনিক ছন্দ-তানের ভাষাচিত্র খুঁজে পান। *রৌদ্র করোটিতে*'তে লব্ধ এই 'স্টাইল'টিই শামসুর রাহমানের কবিতার মৌল লক্ষণ হয়ে বাংলা কবিতায় একটি নতুন অভিপ্রায় সংযোজন করে। মূলত, এটিই বাংলাদেশের কবিতায় রাহমানীয় নান্দনিকতা বলে অধিক পরিচিত।

প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে কাব্যে কবি যে আত্মগত 'নার্সিসাস' চেতনার অধীন, বস্তুত, তা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত নয়। তখনো তিনি 'বেতো ঘোড়াটি'র মতো খোঁয়ারিতে আচ্ছন্ন, অহং-সম্পন্ন কিংবা কখনো স্বপ্নবান। যে 'নরকে' তাঁর বাস, সেই নরকের নাড়ি-নক্ষত্র সম্পর্কে তিনি তখনো অজ্ঞাত। ফলে, তিনি অভিযোজন-বিমুখ, অন্তর্লোকচারী। কিন্তু অনতিকাল পরেই অভিজ্ঞতাসূত্রে যখন কবি এই নগরেরই একজন হয়ে ওঠেন কিংবা নাগরিক জীবনের ব্যস্ততা ও কোলাহল যখন কবির আত্মতার ধ্যান ভেঙে দেয়, তখন সেই কৃত্রিম কল্পনালোক নিষ্প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। কবি তাঁর আগন্তুক-সত্তার নির্মোক ছিন্ন করে *রৌদ্র করোটিতে*'তে প্রত্যক্ষ জগতের সাথে অন্তর্জগতের সমন্বয় সাধনে সমর্থ হন। *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* কাব্যে 'ল্যাজারস'রূপী কবির নানা বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা ও নিঃসঙ্গতা *রৌদ্র করোটিতে*'তে সূর্যরশ্মির মতো ছড়িয়ে পড়ে বহু রেখায় — তাঁর একক বিপন্নতা বহু ছোট-ছোট বহিরাশ্রয়ে সংক্রামিত হয়ে কবির চৈতন্যকে যেমন লঘুভার, তেমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ করে তোলে। নগরীর পরিপার্শ্ব ও তার বিভিন্ন 'অবজেক্ট'-এর মধ্যে নিজের ঘনীভূত বিচ্ছিন্নতাকে ছড়িয়ে দিয়ে কবি জীবন ও জগতের সাথে একাত্ম হন। জীবনের কুৎসিত ও সুন্দরকে তিনি 'আংটি'র মতো ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে লক্ষ করেন — কবিতায় জীবনের সেই রূপকে প্রকাশ করেন খণ্ড-খণ্ডরূপে, বিচিত্র কোলাজে, বহু ছোট-ছোট চরিত্রের চেতন-অবচেতনসূত্রে — নতুন আবিষ্কৃত এক নান্দনিক পরিকাঠামোয়। *রৌদ্র করোটিতে*'র প্রথম কবিতা, 'দুঃখে'র মতই তিনি ছড়িয়ে দেন নিজেকে বহু অনুষঙ্গে, জীবনের বিচিত্র মাত্রায়। পরিণত কবি মন থেকে মুছে ফেলে দেন ছোট-খাটো পাপবোধ। ফলে, যে নগরীতে একদিন 'ল্যাজারসে'র মতো বিপন্ন,

বিবর্ণ ও মূক হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন, সেই নগরীর একান্ত আপনজন হয়ে ওঠেন তিনি। বহির্জগৎ ও ব্যক্তি কবির মধ্যে এক তিক্ত-মধুর সৃজনশীল সখ্য গড়ে ওঠে এবং মিথ-প্রতীকের গূঢ় নান্দনিকতা ত্যাগ করে তিনি কবিতার নতুন আঙ্গিকে হয়ে ওঠেন বহুমুখী — কবিতার 'সাবজেক্টিভিটি' প্রায় সম্পূর্ণই পরিহার করেন। বহ্নিমান শহরের অলিতে-গলিতে-পার্কে-এভিন্যুয়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে মেলে দিয়ে কবি প্রত্যক্ষণ করেন বিচিত্র দৃশ্য ও চরিত্র। ফলে, জীবনমুখী প্রেষণা, সৃজনশীল প্রত্যক্ষণ এবং অন্তর্দর্শনসূত্রে তিনি চলমান জীবনের অনতিরঞ্জিত বাস্তবতাকে কোনো রাখ-ঢাক ছাড়াই উপস্থাপন করেন কবিতায় — এমনকি কখনো-কখনো পরিসংখ্যানাকারে ব্যক্ত করেন তথ্য — এ পাড়ায় ১৭টি উজবুক, ৫জন বোবা/সাতটি মাতাল আর তিনজন কালা বেঁচে বর্তে/আছে আজো দুর্দশার নাকের তলায় ('খুপরির গান', *রৌদ্র করোটিতে*)। *রৌদ্র করোটিতে*'তে কবির জগৎ হয়ে ওঠে নগরীর বিচিত্র শব্দ ও দৃশ্যময় — বাস-মোটরের হর্ন, চুলের কলপ বা টনিকের ক্যানভাসিং, ঊর্ধ্বশ্বাস ট্রাফিক, রাত্রির ফুটপাত, পার্কের জীবনের বৈচিত্র্যে তাঁর মস্তিষ্ক হয়ে ওঠে বহ্নিমান শহরের অদ্বিতীয় প্রতিরূপক —

> আমার মাথাটা যেন বহ্নিমান একটি শহর
> যেখানে মানুষ, যান, বিজ্ঞাপন, রেডিয়োর গান,
> ভিখিরির চ্যাঁচামেচি, বেশ্যার বেহায়া অনুরাগ,
> কানাঘুষো, নামহীন মৃত শিশু আবর্তিত শুধু।
> ('স্বগত ভাষণ', *রৌদ্র করোটিতে*)

প্রতিদিন দেখা নগর ঢাকার বিচিত্র জীবনের ধারণা থেকেই জন্ম নেয় শামসুর রাহমানের *রৌদ্র করোটিতে* কাব্যের নতুন 'স্টাইল'। এমনকি সেই জীবনের মধ্য থেকেই জন্ম নেয় তাঁর কবিতার শব্দ-ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি। প্রকৃতপক্ষে, শামসুর রাহমান বাংলা কবিতায় একজন নাগরিক কবিরূপেই আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছেন। "পূর্ববাংলার সাম্প্রতিক কবিতা" শিরোনামে লেখা কবির একটি প্রবন্ধে চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে তাঁর সমকালীন কবিদের কাব্য সমালোচনা প্রসঙ্গে শহরকেন্দ্রিক বাংলা কবিতার অপ্রতুলতার কথা উল্লেখ করেছিলেন সে সময় এবং গ্রামকেন্দ্রিক পূর্ববাংলায় পল্লি-জীবনকেন্দ্রিক কবিতার পাশাপাশি নাগরিক কবিতার অপরিহার্যতার দাবি জানিয়েছিলেন —

> স্বীকার করছি, এ দেশের মানুষ প্রধানতঃ পল্লীকেন্দ্রিক সাহিত্য তৈরী করবে, কিন্তু তাই বলে শহরকে আমরা আসর থেকে নির্বাসিত করবো না। আর কোনো সাহিত্যিক যদি শহরকে কেন্দ্র করে সৎ সাহিত্য তৈরী করেন তাহলে তাঁকে 'শহুরে' বলে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার দুর্মতি হওয়া উচিত নয় কোনোমতেই। শহরকে আমরা নির্বাসিত করতে পারি না, কেননা আমাদের বর্তমান জীবনে শহর কিছু কম প্রভাবশালী নয়। ধরতে গেলে শহরই আধুনিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র হয়ে পড়ছে। এ কথা খুবই সত্যি শহরে রয়েছে নোংরামি, কুশ্রীতা, হিংসা, লালসা আর কালো ধোঁয়া — কিন্তু তাই বলে শহরকে আমরা ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি না, তারও একটা স্বতন্ত্র সত্তা রয়েছে, সৌন্দর্য রয়ে গেছে। (শামসুর, ১৯৯১ : ২৭৫)

শামসুর রাহমানের কাছে নগর মানে ক্রমবর্ধমান ঢাকা — শৈশবে দেখা মাহুতটুলি, পুরানা-পল্টন, আরমানিটোলার পুরনো নগরের ক্ষয়িষ্ণু জীবন থেকে নতুন পুঁজির বিকাশে ঊর্ধ্বমুখী নব্য ঢাকার ব্যস্ত জীবনে পদার্পণের চালচিত্র। শামসুর রাহমান নগর ঢাকার এই সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম সাক্ষী। উদীয়মান এই শহরের গর্ভ থেকে জায়মান এক প্রাণ শামসুর রাহমান। শহর আর কবি সমান বয়সী বলে এর আলো-অন্ধকার, স্মৃতি-বর্তমান, জন্ম ও বিকাশের ইতিহাস নখদর্পণে ছিল তাঁর। *রৌদ্র করোটিতে*'তে কবি তাঁর সেই চেনা জগতের সাথে সুর মেলান — সে জীবনের দৈনন্দিন হাল-চালকে ছন্দায়িত করেন এবং সেই সূত্রে বাংলা কবিতায় জন্ম নেয় নতুন নাগরিক শব্দ-ভাষা। সমালোচক খান সারওয়ার মুরশিদ যথার্থই বলেন — "শামসুর রাহমানের সমগ্রতার প্রসঙ্গে যে কথাটা প্রথমেই মনে আসে, তা হলো তাঁর ভাষা। সন্দেহ নেই, এ কবির অবদানের সবচেয়ে বড় দিক তাঁর কাব্যভাষার 'ধারণক্ষমতা', জটিলতা ও বিস্তৃতি। ব্রিটিশ-উত্তর পূর্ব বাংলার নব-উদিত মধ্য সমাজের সব আবেগ ও প্রয়োজনের ভাষার তিনি প্রায় একক মহৎ নির্মাতা। ... পূর্ব বাংলার তখনকার প্রায় বিরানভূমিতে শামসুর রাহমানের আবির্ভাব — প্রবল প্রচুর, উৎকর্ষে উজ্জ্বল, স্বকীয়, একান্ত আধুনিক। বস্তুত, শামসুর রাহমানের ভাষার আয়তন অনেক : তাঁর ভাষা একটি সমাজের উত্থানের ভাষা, একই সাথে জাতিসত্তার অশ্রু-উৎসবময় উন্মোচন বিকাশ ও দুঃসময়ের ভাষা। সর্বোপরি তাঁর ভাষা আধুনিক সমাজ ও মানুষের ভাষা" (সারওয়ার, ২০০৬ : ৪৬-৪৭)। প্রথম কাব্যে এক আত্মময় বিষাদচেতনার অধিকারী থাকায় কাব্যভাষার সাথে কবির সম্পর্ক ছিল কিছুটা একান্ত। *রৌদ্র করোটিতে* এসে নাগরিক নীলকণ্ঠ কবির ভাষা নগর ঢাকার নির্বিশেষ মানুষের বিবিক্তি, বিস্ময়, কোলাহল ও কান্নাকে একইসাথে উদগীরণ করতে থাকেন দারুণ উদ্যমে, অপ্রতিহত আবেগে।

রৌদ্র করোটিতে'তে কবি আর আগন্তুক নন, বরং তাঁর চোখ খুঁজে বেড়ায় শহরের অলিতে-গলিতে ইতস্তত ভ্রাম্যমাণ সব আগন্তুক চরিত্রদের। ডিলান টমাসের (১৯১৪-১৯৫৩) কাব্য-জগতের মতই রাহমানের *রৌদ্র করোটিতে* হয়ে ওঠে চেনা-অচেনা বিচিত্র চরিত্রের আস্তানা — শতচ্ছিন্ন তালি-মারা কোট গায়ে গলির রহস্যময় বুড়োটা, বাউণ্ডুলে ময়লা ভিখিরি, লম্পট, জোচ্চর, গণ্ডমূর্খ, ভণ্ড ফকির, অর্ধনগ্ন ভস্মমাখা উন্মাদিনী, বেহেড মাতাল — যাদের এমনকি চরিত্র হওয়ার যোগ্যতা নেই, তারাই হয়ে ওঠে রাহমানের কবিতার জীবন্ত 'অবজেক্ট'। নাগরিক প্রতিবেশ, পুঁজিবাদী অর্থনীতি, শ্রেণিবৈষম্যের সমাজে যারা নিঃসঙ্গ ও উন্মূল হতে বাধ্য — অবদমিত-কাম যারা জীবনের স্বাদ 'টক' জেনে কল্পলোকবিহারী, স্মৃতির সম্পন্নতা আর বর্তমানের বৈরিতার মধ্যে যাওয়া-আসা যাদের — যারা বাস করে একই সাথে বাস্তব ও অধিবাস্তব জগতে, তাদের অন্তর্লোক-বহির্লোক, চেতনাস্রোত, স্বপ্ন ও বিভ্রমের (delusion) ইন্দ্রজাল শামসুর রাহমানের কবিতার উপজীব্য হয়ে ওঠে।

'পার্কের নিঃসঙ্গ খঞ্জ' কবিতায় রোঁয়া ওঠা কুকুরের সাহচর্যে আর দুষ্টু বালকদের দৌরাত্ম্যে অস্থির যে খঞ্জ জোৎস্নার করোটিতে সুতীব্র মদিরা পান করে রাত্রির

নির্জনতায় ভাবে 'নুলোর বউয়ে'র কথা, যাকে সে পাবে না কোনোদিন, সেই অবদমিত-কাম খঞ্জের অন্ধ চেতনাস্রোতকে শব্দ-ভাষায় মূর্ত করেন কবি —

> একতাল শূন্যতায় ভাবে
> বেহেশতের হুরি যায় কশাই চামার
> ছুতোর কামার আর
> মুটে মজুরের ঘরে আর দরবেশের গুহায়
> বাদশার হারেমে সুন্দরী বাদী যদি
> বিলাসের কামনার খাদ্য হয় সোহাগ জোগায়
> বিলোল অধরে
> গড়ায় ক'ফোঁটা পানি ক্ষুধিত পাষাণে
> অথবা নুলোর বউ কাঁদে ভাদ্রের দুপুরে
> তবে যে লোকটা হেঁটে যায়
> বিকেলের মোলায়েম রোদে
> তার কীবা এসে যায়"
>
> ('পার্কের নিঃসঙ্গ খঞ্জ', *রৌদ্র করোটিতে*)

মূলত, ডিলান টমাসের 'The Hunchback in the Park' কবিতার খঞ্জকেই শামসুর রাহমান প্রত্যক্ষ করেন পুরনো ঢাকার পার্কের কোনো নিঃসঙ্গ খঞ্জের মধ্যে। ডিলান টমাসের খঞ্জও ঠিক একইভাবে দুষ্ট বালকদের দৌরাত্ম্য পেরিয়ে রাতের নির্জনতায় কুকুরের সাথে একই 'ক্যানেলে' শুয়ে কল্পনা করে কুঁজহীন, লম্বা, নিখুঁত-শরীর কোনো নারীকে —

> Made all day untill bell time
> A woman figure without fault
> Straight as a young elm
> Straight and tall from his crooked bones
> That she might stand in the night
> After the locks and chains
>
> (Thomas, 1972: 105)

ডিলান টমাস তাঁর 'I see the boys of summer' কবিতায় যেমন এঁকেছেন গ্রীষ্মের বালকদের (Thomas, 1972: 105), কিংবা 'Find meat on Bones' কবিতায় শুষ্কস্তন মাতাদের বুভুক্ষু সন্তানদের যেমন দেখেছেন উচ্ছিষ্ট হাড়ের ভেতর পরম নিষ্ঠায় মাংস খুঁজতে, তেমনি শামসুর রাহমান তাঁর কবিতায় এনেছেন বুভুক্ষের পরিমেল খুঁজে ফেরা তিনটি বালককে ('তিনটি বালক, *রৌদ্র করোটিতে*)। *রৌদ্র করোটিতে*'তে এই চরিত্রপ্রধান কবিতাগুলোতে চরিত্রের 'মুড্' পরিবর্তনের সাথে সাথে কবিতা সামনের দিকে অগ্রসর হয়। চরিত্রের মনোজাগতিক ভাবান্তর, সংলাপ, চেতনাপ্রবাহ কিংবা স্বগত-কথনের সূত্রে স্তবকে-স্তবকে কবি বুনে চলেন কবিতা। ফলে, কবিতায় ছদ্ম-নাটকীয়তার আস্বাদ পাওয়া যায়, সেই সাথে এক ধরনের রোমান্টিক বিষাদ ও তীব্র

'আয়রনি' তৈরি হয়। চরিত্রের অবচেতনাসূত্রে কবিতায় কখনো জেগে ওঠে কোনো বিভ্রম। যেমন 'তিনটি বালক' কবিতায় খোলা আকাশের নিচে ফুঁটো কাঁথা গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকা বালকদের স্বপ্নকে বিভ্রমের মতো জাগিয়ে তোলেন কবি উদ্ভাসন প্রক্রিয়ায় একটি স্মৃতি-সঞ্চারিত চিত্রকল্পে (ivocative image) —

> ফুটোভরা কাঁথার তলায় শুয়ে তারাময় খোলা
> আকাশের নিচে কোনোদিন
> হয়তো অলক্ষ্যে হয় স্বর্গের শিকার।
>
> মাঝে-মাঝে স্বপ্ন দেখে : ম্লান কুয়াশায়
> এক ঝাঁক ঘুঘু নামে পূর্বপুরুষের
> সম্পন্ন ভিটায়।
> ('তিনটি বালক', *রৌদ্র করোটিতে*)

চরিত্রের চেতন-অবচেতনকে কবি এক আশ্চর্য কৌশলে মূর্ত করেন এই কবিতাগুলোতে। মূলত একটি কেন্দ্রীয় imageকে বিস্তৃত করে তোলেন এবং একসময় সম্পূর্ণ হয় প্রতিমাটি — 'নেশার খোঁয়ারি' কেটে গেলে পৃথিবীকে যেমন মনে হয় 'নির্বোধের হাসির মত'। যেমন 'পার্কের নিঃসঙ্গ খঞ্জ' কবিতায় খঞ্জের অবচেতনাকে জাগ্রত করতে শুরুতেই কবি ভণিতা করেন একটি চিত্রকল্প দিয়ে —

> যেন সে দুর্মর কাপালিক
> চন্দ্রমার করোটিতে আকণ্ঠ করবে পান সুতীব্র মদিরা

সে মদিরা পান করে খঞ্জ শোনে স্বপ্নালু পৃথিবীর ধ্বনি ঝরে পড়ার শব্দ — 'হরিণের কানের মতন', 'উচ্ছল মাছের রূপালি আঁশের মতন'। তারপর একটি চিত্রকল্প দিয়ে কবি খঞ্জের স্মৃতিকে জাগ্রত করেন — 'আর স্মৃতিগুলো একপাল কুকুরের মত / খিঁচিয়ে ধারালো দাঁত মনের পিছনে করে তাড়া'। বস্তুত, পূর্বপুরুষের 'স্মৃতিবিষে' আচ্ছন্ন *রৌদ্র করোটিতে*র প্রায় প্রত্যেকটি আগন্তুক চরিত্র। কবির অন্তর্দর্শনসূত্রে এটি তাঁর চরিত্রগুলোর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। অতঃপর কবি একটি বিভ্রম সৃষ্টির মাধ্যমে সেই খঞ্জের মগ্নচেতনার অবদমিত কামনাকে ব্যক্ত করেন 'বেহেশতের হুর', 'বাদশার হারেমের সুন্দরী বাঁদি' আর 'নুলোর বউ'য়ের অনুষঙ্গে। *রৌদ্র করোটিতে*'র আগন্তুক চরিত্রগুলো কম-বেশি অবদমিতরূপে কামুক — টি. এস. এলিয়টের বিখ্যাত 'আলফ্রেড প্রুফ্রকে'র মতো। সুতরাং, এটিও চরিত্রায়ণের একটি কৌশল। তারপর একটু থেমে খঞ্জের চেতনাস্রোতকে অনিয়মিত করে কবি তার বাহ্যিক পরিপার্শ্বকে চিত্রিত করেন — মাতাল, ভিখিরি, লম্পট, জোচ্চোর সরব রাত্রের পার্কের দৃশ্যায়ন ঘটান। এরপর বিপরীতধর্মী একটি রোমান্টিক রূপকল্প আঁকেন কবি — 'রজনীগন্ধ্যার ডালে কাগজের মত চাঁদ বোনে / স্বপ্নের রূপালি পাড়'। বস্তুত, এটি রাহমানের কবিতার একটি পরিচিত 'টেক্‌নিক', যা দিয়ে তিনি 'খেঁকি কুকুর' আর 'পূর্ণিমা' কিংবা 'রজনীগন্ধ্যা' ও 'চিমনীর

ধোঁয়া'কে, অর্থাৎ ক্লেদ আর সৌন্দর্যকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য উপাদান করে তোলেন। নাগরিক জীবনের অম্ল-মধুরতাকে কবি এভাবেই সমন্বিত করেন। তারপর একটি বিপরীত-স্বভাবী উৎপ্রেক্ষা খঞ্জের রোমান্টিকতাকে তছনছ করে দেয় প্রবল অনাস্থায় — রাহমানের কাব্যে যে অলংকারটি বারংবার ব্যবহৃত হয় — 'একটি কর্কশ পাখি / আত্মাকে ঠুকরে বলে তোমার বাগান নেই ব'লে / রক্তিম গোলাপ আসবে না'। এভাবে কবি খঞ্জের জীবনের নিঃসীম শূন্যতার অবধারিত বাস্তবতার ইঙ্গিত করেন, যা কবিতায় জন্ম দেয় অনমনীয় এক 'আয়রনি'। নুলোর বউটা খঞ্জের চেতনায় একবার উঁকি দিয়ে চলে গেলে কবি খঞ্জকে নিয়ে আসেন বস্তুলোকে — আবারো 'রোঁয়া ওঠা কুকুরের সাহচর্যে', 'গ্রীষ্মের গোধূলিতে', 'বিষাদের ঘরে' অন্তহীন নিঃঙ্গতায় এবং সেই সাথে কেন্দ্রীয় 'ইমেজটি'ও পরিপূর্ণ ও সমাপ্ত হয়। এইভাবে কবি একটির পর একটি চিত্রকল্পে, চেতনাপ্রবাহে, নাটকীয়তায় কেন্দ্রীয় ইমেজটিকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিমারূপে দাঁড় করান। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, একটি দুটি চিত্রকল্পে সীমাবদ্ধ নয় রাহমানের এই চরিত্র-নির্ভর 'ইমেজ' কবিতাগুলো। কারণ, কবির অনুপুঙ্খ বা 'ডিটেইল' বর্ণনার ঝোঁক থাকে, তবে, অসাধারণ মাত্রাচেতনায় তিনি কবিতার আদি-অন্ত্যকে একটি সম্পূর্ণ প্রতিমায় মূর্ত করে তোলেন। কিন্তু ওগুলো ঠিক বিংশ শতাব্দীর চিত্রকল্পবাদী কবিদের (imagist poet) চিত্রকল্প-নির্ভর কবিতার মতো নয়। চিত্রকল্পবাদী কবিদের কবিতায় তীব্র, তীক্ষ্ণরূপে স্ফূলিঙ্গের মতো একটি চিত্রকল্প চমকিত হয়ে উঠত। অনেকক্ষেত্রেই একটি মাত্র মোক্ষম চিত্রকল্পই সংক্ষিপ্ত একেকটি কবিতার উপজীব্য ছিল। ওইরূপ ঋজু, স্বচ্ছ, লিরিক ও সংহত চিত্রকাল্পিক কবিতায় চেতনাকে দীর্ঘায়িত করার কোনো উদ্দেশ্য থাকত না কবির। সংক্ষিপ্ততাই 'ইমেজিস্ট' কবিদের মূল লক্ষ্য ছিল। এজরা পাউণ্ড কবিতায় বর্ণনাকে পরিহার করতে বলেছিলেন — Don't be descriptive; remember that the painter can describe a landscape much better than you can, and that he has to know a deal more about it. (Pound, 1966: 323) কিন্তু, শামসুর রাহমান *রৌদ্র করোটিতে*'তে সে নির্দেশ অগ্রাহ্য করেন, কারণ এজরা পাউন্ডদের Image কবিতার মতো ঘন পিনদ্ধ, চিত্রকল্প-প্রাণ কবিতা তিনি রচনা করতে চাননি 'রৌদ্র করেটিতে'তে বরং উপমা-চিত্রকল্পকে তিনি সচেতনভাবে ভেঙে দিয়ে ভাষাকে বর্ণনাত্মক করে তুলেতে চান। আধুনিক কবিতার সচেতন শব্দ-বিন্যাস ও ভাস্কর্যধর্মী কাঠামো থেকে বেরিয়ে শব্দ-ভাষার স্বাধীনতাকে আবিষ্কারই শামসুর রাহমানের কবিতার সবচেয়ে বড় স্বাতন্ত্র্য। তিনি বিভিন্নভাবে সে কাজটি করেছেন তাঁর বিভিন্ন পর্বের কবিতায়। শামসুর রাহমানের চরিত্র-প্রধান কবিতাগুলোতে একটি কেন্দ্রীয় image পরিকাঠামো থাকলেও তা ঐ Image কবিতার ঠিক বিপরীত-স্বভাবী। কারণ, রাহমানের এই কবিতাগুলো মূলত 'ন্যারেটিভ', মুক্তপ্রান্ত, চেতনাস্রোতে দীর্ঘ ও নমনীয়, নাটকীয় বৈশিষ্ট্যরূপে সংলাপ-স্বগতকথন, চেতনার উল্লম্ফন প্রকাশে juxtaposition প্রভৃতির ব্যবহারে তা দীর্ঘ ও বর্ণনাধর্মী।

নাগরিক জীবনের বিচিত্র দৃশ্যের প্রত্যক্ষণই *রৌদ্র করোটিতে*'তে কবির প্রধান প্রবর্তনা। জীবনকে দেখার বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি কবির চালিকাশক্তি এবং প্রাত্যহিক জীবনের গভীরে যে ছোট-ছোট 'আয়রনি' লুকিয়ে থাকে অথবা সে 'আয়রনি'র ভেতর যে সত্য চাপা পড়ে থাকে, সেগুলোকেই উদ্‌ঘাটন করেন কবি এবং তার প্রকাশে দৈনন্দিন জীবনের শব্দ-ভাষা ও সংলাপকেই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ব্যবহার করেন। যেমন 'খেলনার দোকানের সামনে ভিখিরি' কবিতায় যে হাড্ডিসার নোংরা ভিখিরিটি দোকানির প্রচণ্ড তিরস্কারে লাঞ্ছিত হয়ে টলতে-টলতে চলে যায় উদ্দেশ্যহীন গন্তব্যে, তার নিপতিত, ধ্বস্ত ও স্রস্ত চেতনাকে কবি প্রকাশ করেন নাটকীয়তায়, সংলাপে, স্বগত-কথনে, টুকরো টুকরো কোলাজে, চেতনাপ্রবাহের উল্লম্ফনে —

> দূর হ এখান থেকে হা-ভাতে ভিখিরি কোথাকার
> আস্তাকুঁড়ে বেছে নে, আস্তানা, নোংরা খুঁটে খা-গে' —
> দোকানি খেঁকিয়ে ওঠে। খেলনা ফেলনা নয় জানি,
> এখন এখান থেকে, আল্লা, যাব কোন জাহান্নামে।
> খেলনা ফেলনা নয়। ফলের বাজার, পুতুলের
> স্থির চোখ-পিরের মাজার, হৈ চৈ মানুষের ভিড়,
> গাঁয়ের নদীর তীর গুঞ্জরিত বাউলের স্বরে...
> গেরস্তপাড়ায় বেশ্যাবৃত্তি, ভালুক বাজায় ব্যান্ড,
> খেলনা ফেলনা নয়... বাজনা বাজে, ফলের বাজার,
> ফ্রক পরা ফুটফুটে মেয়েটির একটি দু'আনি
> হাতের চেটোয় নাচে, কাঁচের আড়ালে দুই যোদ্ধা,
> সেপাই রাঙায় চোখ, ভদ্দর পাড়ায় বাজনা বাজে,
> 'আস্তাকুঁড়ে বেছে নে আস্তানা', খেলনা ফেলনা নয়....
> ('খেলনার দোকানের সামনে ভিখিরি', *রৌদ্র করোটিতে*)

দোকানির তিরস্কারে লাঞ্ছিত ভিখিরির উদভ্রান্ত চেতনাকে প্রকাশ করতে টুকরো-টুকরো বাক্য ও বাক্যাংশের 'মন্তাজ' নির্মাণ করেন কবি। বাক্যের ছোট-ছোট উল্লম্ফন চরিত্রের ভাবের আনুগত্যে ঐকিক হয়ে ওঠে। ওই স্মৃতি-স্ফুরিত, স্থান-কাল-নির্বিশেষ, যৌক্তিক পারম্পর্য-বিঘ্নিত ভিখিরির চেতন-অবচেতনের ভাবগুলোকে এলোমেলো, পরস্পর সংযোগহীন বাক্য টুকরোর সমন্বয়েই যথাযথভাবে প্রকাশ করা সম্ভব। বিচিত্র শব্দ-ধ্বনির তালগোল পাকানো বিশৃঙ্খলার মধ্যেও দোকানির তিরস্কারে ভিখিরির উদ্বাস্ত চেতনার পীড়াদায়ক বাক্যানুষঙ্গ — 'খেলনা ফ্যালনা নয়', 'খেলনা ফেলনা নয় জানি' — বারবার উচ্চারণের মধ্য দিয়ে নাটকীয় 'আয়রনি' যেমন উত্তুঙ্গ হয়ে ওঠে, তেমনি কবিতায় সঞ্চারিত হয় একটি অন্তর্নিহিত ছন্দস্পন্দন। দিনানুদৈনিক জীবনের এই সব অনাবিষ্কৃত 'আয়রনি'গুলোকে উদ্‌ঘাটন এবং প্রান্তিক চরিত্রগুলোর প্রেক্ষণ থেকে সেগুলোর বিচিত্র উপস্থাপনই কবির উদ্দিষ্ট।

শামসুর রাহমান নানা চরিত্রের চেতনাপ্রবাহকে বাক্য-বাক্যাংশের উল্লম্ফন, চিত্রকল্প এবং চরিত্রানুগ শব্দ-ভাষার প্রয়োগে যৌক্তিক শৃঙ্খলায়, বাস্তবোচিতভাবে শিল্পিত করেন। কল্পনার সাথে বুদ্ধিবৃত্তির সম্পর্কে বস্তুজাগতিক আচরণ, অভ্যাস ও চরিত্রের 'অ্যানাটমি'কে প্রায় উপন্যাসোচিতভাবে উন্মোচন করেন কবি। ফলে, *রৌদ্র করোটিতে*'তে শব্দ-ভাষায় কুহক বা কল্পনার অতিরঞ্জন নেই। বস্তুত, শামসুর রাহমানের এ কাব্যে বিপর্যস্ত চেতনা নিয়ে 'কাফকার নায়কের' মতোই ইতস্তত ঘুরে বেড়ায় চরিত্রগুলো, পার্কে, রাজপথে, রুটির দোকানের সামনে কিংবা রকবাজ সন্তদের আড্ডায়। 'শনাক্ত পত্র' কবিতায় শামসুর রাহমান টি.এস.এলিয়টের আলফ্রেড প্রুফ্রকের মতো অবদমিত-কাম তিনজন বেকার যুবককে জড়ো করেন, যারা জীবনের 'সূর্যোদয় কখনো দ্যাখেনি বলে' সূর্যাস্তের কাছে ধরনা দেয় প্রতিদিন — জ্বলন্ত সিগারেটে টান দিয়ে অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে যারা একইরকমভাবে তাদের প্রত্যেকের সার্থকতাহীন জীবনকে উপস্থাপন করে —

> 'আমার জীবনে সুখ নেই' প্রথম যুবক বলে।
> 'আমার জীবনে সুখ নেই', বাতাসে দ্বিতীয় স্বর।
> নকশা আঁকে হিজিবিজি। চিন্তার কপাটে পড়ে খিল।
> 'আমার জীবনে সুখ নেই', বলে তৃতীয় কথক।
> ('শনাক্তপত্র', *রৌদ্র করোটিতে*)

উদ্ধৃতাংশে 'আমার জীবনে সুখ নেই' সংলাপের পুনঃপুনরাবৃত্তি ঐ তিন যুবকের জীবনের আশা ও স্বপ্নহীনতার গভীর অবসাদময়তার শব্দ-ভাষা শোনায়। প্রায় অ্যাবসার্ডিটির কাছাকাছি উপনীত তিন যুবক জীবনের অর্থহীনতায় নিমজ্জিত। বিলীয়মান সূর্যাস্তের লালিমার মতোই ম-ান থেকে ম-ানতর হয়ে যায় তাদের অবদমিত সত্তায় সঞ্চিত উত্তাপের স্মৃতিও — প্রথমে 'মোটরে দেখা মহিলার ঠোঁটে'র মতো তীব্র রক্তিম, অতঃপর ম্লানতর 'রাশেদা ভাবির ঠোঁট এবং সব-শেষে 'উত্তপ্ত সন্ধ্যার গণিকা'র মলিন ঠোঁট কল্পনার সাথে-সাথে। এরপর কবি এক আশ্চর্য শৈলীতে ভাষাকে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক করে তোলেন তাঁদের অর্থহীন বেঁচে থাকাকে শব্দায়িত করতে —

> প্রথম যুবক দ্যাখে দ্বিতীয়ের চোখে
> নেই তার নিজের চোখের মনি, তৃতীয়ের চোখে
> সেখানে কাঁপছে মৃদু। দ্বিতীয় কথক দ্যাখে তার
> নিজের থ্যাবড়া নাক নিয়েছে প্রথমজন কেড়ে।
> হোক না কার্বন কপি পরস্পর, কী-বা আসে যায়
> রকবাজ সন্তদের ভিড়ে, ওহে, কী-বা আসে যায়...
> প্রাণপণ হেঁকে বলো শূন্যতায় কী-বা আসে যায়!
> ('শনাক্ত পত্র', *রৌদ্র করোটিতে*)

কবি এভাবেই ভাষাকে চেতনার অনুরূপ করে তোলেন — শব্দ-ভাষাই জীবনের 'অ্যাবসার্ডিটি' প্রকাশে সমর্থ হয়। চরিত্র-প্রধান এই কবিতাগুলোতে শামসুর রাহমান

বয়ানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রেক্ষণ বা দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করেছেন। 'পার্কের নিঃসঙ্গ খঞ্জ', 'তিনটি বালক', 'শনাক্তপত্র' কবিতাগুলোতে মূলত কবির সর্বজ্ঞ প্রেক্ষণবিন্দু আরোপিত হলেও 'খেলনার দোকানের সামনে ভিখিরি' কবিতায় ভিখিরির দৃষ্টিকোণ আর কবির প্রেক্ষণ অভিন্ন। কবি ব্যবহার করেন দ্বৈত দৃষ্টিকোণ বা double vision — উপন্যাসের ক্ষেত্রে যাকে বলা হয় স্বাধীন অপ্রত্যক্ষ বয়ানরীতি (free inderect discourse)। দ্বৈত প্রেক্ষণে কবি তাঁর অন্তঃসভাবকে সঞ্চালিত করেন প্রথম পুরুষের বক্তব্যে — আলফ্রেড প্রুফ্রকের চেতনায় অনুপ্রবিষ্ট হন টি.এস. এলিয়ট যেমন[২] —

> ডেপুটি হাকিম নই, নই ভবঘুরে কবি;
> পথের গোলাম আমি, বুঝেছ হে অলীক হুকুমে
> চৈত্ররাতে ফুটপাতে শুই। ঠ্যাং দু'টি একতারা
> হয়ে বাজে তারাপুঞ্জে, মর্মরিত স্বপ্নের মহলে
> বাউলের কথামৃত স্বপ্নে হয় আমের বউল।
> ('খেলনার দোকানের সামনে ভিখিরি', *রৌদ্র করোটিতে*)

স্পষ্টতই বোঝা যায়, ভিখিরির বাস্তব জীবনে কবি মিশিয়েছেন কবিত্ব আর কবির জীবনে বাস্তবতা জুগিয়েছে ভিখিরির জীবন এবং দুই জনের ভাবনা ও প্রেক্ষণে তা তৈরি করে গভীর মর্মতলের সাদৃশ্য। মূলত 'রৌদ্র করোটিতে'তে কবির চেতনা ও অভিজ্ঞতার সাথে সাধারণ মানুষের চেতন-অবচেতনলোক অভিন্ন নান্দনিক স্পন্দনে এক হয়ে মিশে থাকে। সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম একটি প্রবন্ধে সমর সেনের শহর-চিত্রণ অপেক্ষা শামসুর রাহমানের নগর-দৃশ্যায়নকে অধিকতর বাস্ড়ব বলে মন্তব্য করেন। কারণ, শামসুর রাহমান "প্রথমেই, মিশে যান শহরের অস্থিমজ্জায় অথবা আমরা একটু ঘুরিয়ে বলতে পারি, ঐ শহর মিশে থাকে তাঁর অস্থিমজ্জায়। তাঁর কবিতার বিষয় ও ফর্ম একই সঙ্গে হয়ে দাঁড়ায় — ঐ শহর। ... শহর ও কবি পরস্পরের স্থান দখল করে, করতে পারে" (মনজুরুল, ২০০৬ : ১৮৩)। বস্তুতই, *রৌদ্র করোটিতে*'তে কবির চেতনা ও জনগণের চেতনা দ্বিতল ভবনের মতো এক হয়ে জুড়ে থাকে। কবি স্পর্শ করেন সমাজের নিম্নতল থেকে উপরিতল পর্যন্ত। সমকালের আর্থ সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়ও সংরক্ষিত থাকে কবির চেতনায়। কবি নানা বিচ্ছিন্ন 'টেকনিকে' সেইসব ভাব ও অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করেন। কবি আকাশকে উপমায়িত করেন রাজমিস্ত্রির ছানিপড়া চোখের সাথে, রক্ষিতার যৌবনকে তুলনা করেন কুঞ্চিত মলিন কাপড়ের সাথে আর রাজপথে মোটরের সারির উপমান উৎস হয় গাছের ডালে বসে থাকা পাখির ঝাঁক (যদি ইচ্ছে হয়, *রৌদ্র করোটিতে*)। এভাবেই কবি স্পর্শ করেন 'এভিন্যুয়ের মধ্যরাত্রির স্তব্ধতা' থেকে 'কলোনির জীবন মথিত ঐক্যতান' পর্যন্ত। কবি নিত্যই অভিনব কৌশলে আবিষ্কার করেন নাগরিক জীবনে পূর্ণিমার চাঁদ আর খেঁকি কুকুর, চিমনির ধোঁয়া ও রজনীগন্ধার সম্পর্ক রহস্য। মুদ্রার মতো জনাকীর্ণ এই নগরীতে কবি নিজেই মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি হয়ে অনুভব করেছেন — 'একটি প্রখর পাখি ঠুকরে ফেলে দেয়

অবিরত পোকা খাওয়া মূল্যবোধ'। স্বপ্ন ও মৃতকল্প জীবনের বৈচিত্র্য কবি খণ্ড-খণ্ড চিত্রে, ছোট-ছোট বাক্যাংশে, সংলাপে, কমায়-সেমিকোলনে জোড়া দিয়ে দিয়ে প্রকাশ করেন — নির্মাণ করেন ছুঁচোর কেত্তন'ভরা জীবনের বিচিত্র কোলাজ —

> যদি মুখ আদপেই খুলি বলবো কি এপ্রিলের
> উত্তপ্ত হাওয়ায় ঘেমে ঘেমে রোজ হচ্ছি নাজেহাল,
> ব্লাউজ পিসটা চমৎকার ... তোমাকে মানাবে ভালো
> পরো যদি খয়েরি শাড়ির সঙ্গে অথবা হানিফ
> করেছে সেঞ্চুরি ফের, দালাইলামার আত্মজীবনীতে কত
> ঘটনার সমাহার ; বলব কি চলো যাই কফি খাই
> হাল ফ্যাসনের কিছু বই পড়া চাই
> নইলে লাফাবে তুমি এঁদো ডোবা, কুয়োর ভেতরে।
> ('ছুঁচোর কেত্তন', *রৌদ্র করোটিতে*)

বৈচিত্র্যপূর্ণ এমনকি বিপরীতার্থক শব্দ পাশাপাশি বসিয়ে শব্দের উল্লম্ফনে মধ্যবিত্ত জীবন-বাস্তবতার কূটাভাস প্রকাশ করেন কবি। অভ্যাসবিদ্ধ নাগরিক জীবনের গতি ও ছন্দকে প্রকাশের জন্য কবি শব্দের পর শব্দ জুড়ে যে নতুন 'টেকনিক'টি ব্যবহার করেন, সেই রীতিটিই কবিতার ভাবকে প্রকাশ করে। সে ক্ষেত্রে শব্দ-ভাষার কৌশলই ভাবের সংগঠনে মূল ভূমিকা পালন করে। নাগরিক জীবনের ঊর্ধ্বশ্বাস ব্যস্ততা ও হঠাৎ থমকে যাওয়া, গতি ও ক্লান্তি, আশা ও নৈরাশ্যের জটিল মনস্তাত্ত্বিক রূপটি কবি প্রকাশ করেন শব্দ-ভাষার কূটাভাসে —

> শয্যাত্যাগ, প্রাতরাশ, বাস, ছ'ঘণ্টার কাজ, আড্ডা,
> খাদ্য, প্রেম, ঘুম, জাগরণ; সোমবার এবং মঙ্গলবার
> বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি আর রবিবার একই
> বৃত্তে আবর্তিত আর আকাশ তো মস্ত একটা গর্ত্ড়
> সেখানে ঢুকব নেংটি ইঁদুরের মতো। থরথর
> হৃদয়ে প্রতীক্ষা করি, স্বপ্ন দেখি আগামীকালের
> সারাক্ষণ, অনেক আগামীকল্য উজিয়ে দেখেছি
> তবু থাকে আরেক আগামী কাল। সহসা আয়নায়
> নিজের ছায়াকে দেখি একদিন উত্তীর্ণ তিরিশ।
> ('আত্মহত্যার আগে', *রৌদ্র করোটিতে*)

উদ্ধৃতাংশের শুরুতে কবিতায় যে গতি সঞ্চারিত হয়, শেষ উল্লম্ফনকৃত বাক্যটি — 'সহসা আয়নায় নিজের ছায়াকে দেখি একদিন — উত্তীর্ণ তিরিশ — সে গতিকে থামিয়ে দিয়ে আপাতভাবে যতিপতন ঘটায় এবং জীবনকে এক অমোঘ বাস্তবতার মুখোমুখি করে তোলে। এভাবেই চলমান জীবনের মধ্যেই গভীর 'প্যারাডক্সে'র উপলব্ধিকে জাগিয়ে তোলেন কবি। কোনো প্রতিষ্ঠিত জীবন-দর্শন থেকে কবি তা করেন না বরং দৈনন্দিন জীবনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার শব্দ-ভাষাকেই কৌশলে সাজিয়ে এই

আপাতবিরোধী জীবনের ভাষা-চিত্র অঙ্কন করেন। শামসুর রাহমানের *রৌদ্র করোটিতে*তে এভাবেই ভাব শব্দের অনুযাত্রী হয়ে ওঠে — শব্দই কবিতার ভাব নির্মাণ করে। সমালোচক যথার্থই বলেন — "*রৌদ্র করোটিতে* রাহমানের নগরমনস্কতা দৃশ্যদর্শনের নবিশি করে নিজস্ব নান্দনিক ভঙ্গিমায়। চারপাশকে টুকরো করে দেখার সংবেদ-চিত্র তৈরিতে তাঁর পারঙ্গম হয়ে ওঠাও এ কাব্যেই স্বতঃস্ফূর্ত" (আকতার, ২০১৪ : ৫২)। প্রথাগত কবিতায়, এমনকি রাহমানের প্রথম কাব্যে কবির প্রস্তুতকৃত ভাবকে শব্দমালা সাজিয়ে উপস্থাপন করেছেন কবি — শব্দ সেখানে ভাবনার অনুগত হয়েছে বলেই প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত নৈমিত্তিক শব্দের সাথে তার ভেদ ছিল—কবির শব্দ ছিল সুনির্বাচিত, বহুলাংশে কাব্যিক কিন্তু *রৌদ্র করোটিতে*'তে মূলত শব্দই কবিতার ভাবকে নির্মাণ করে বলে বহির্জগৎ অর্থাৎ, কবির নগর ঢাকার জীবন আর কবিতার মধ্যে যোগাযোগের প্রধান দায়িত্বও নেয় শব্দই। ফলে, *রৌদ্র করোটিতে*র শব্দ কবিতার দুরন্বয়কে লাঘব করে — কাব্যিক শব্দ-ভাষার ধার ধারে না এবং অলংকারময়তাকেও অগ্রাহ্য করে। শামসুর রাহমানের শব্দ-ব্যবহারের এই জড়তামুক্তি অগ্রজ আধুনিক কবিদের শব্দপ্রয়োগের অতি সচেতনতার সাথে সুস্পষ্ট প্রভেদ তৈরি করে। *রৌদ্র করোটিতে*'তে কেবল নাগরিক জীবনের প্রাত্যহিক ভাষাই (ordinery speech) নয়, তার কথনভঙ্গিটিকে পর্যন্ত কবি প্রয়োগ করেন কাব্যে। সামাজিক শব্দ-ভাষার প্রয়োগে ভাবকে প্রসারিত করার এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় ভাষার স্বাভাবিকীকরণ (naturalization)। কারণ, এ পদ্ধতিতে কবিতার ভাষা সমস্ত জড়তা ও কৃত্রিমতা পরিহার করে স্বভাবী হয়ে ওঠে — কবিত্বকে গৌণ করে প্রাত্যহিক ও প্রায়োগিক হয়ে ওঠে। মূলত এও এক নতুন ধরনের, সময়োচিত কবিত্ব —

> This critical process I shall call 'naturalisation' an attempt to reduce the strangeness of poetic organisation by making it intelligible, by making the Artifice appear natural. (Riley, 1992: 223)

ভাষার এ স্বাভাবিকীকরণ মূলত বহুজটিল, নানা স্তরিক, ছদ্মবেশী, প্রসাধিত, বাহারী ঠাটের নাগরিক জীবনের যথার্থ শব্দ-ভাষা।

রৌদ্র করোটিতে'তে কবিতার প্রচলিত কাঠামোকল্পকে ভেঙে দিয়ে উপমা-চিত্রকল্পকে কবি খুলে খুলে দেখিয়েছেন এবং সেগুলোকে কোনো ব্যঞ্জনার মহিমা দান করার পরিবর্তে সাধারণভাবে উপস্থাপন করেছেন — কবিতা যেন এমন কোনো 'ম্যাকানিজম', যা খণ্ড-খণ্ড অংশ জুড়ে পূর্ণতা পায়। নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তে দুটি চিত্রকল্প দ্রবীভূত হয়ে যায় কবির বর্ণনায় —

> চেয়ে দ্যাখে প্রায়-নেভা
> আকাশে সূর্যের স্টোভ — সূর্যাস্তের রং দেখে তার
> মনে পড়ে হঠাৎ মোটরে দেখা মহিলার ঠোঁট।
> ('শনাক্ত পত্র', *রৌদ্র করোটিতে*)

উদ্ধৃতাংশে সূর্যের নিভন্ত রং অনায়াসে উপমিত হতে পারত 'স্টোভে'র সাথে কিংবা সূর্যাস্তের রং তুলনীয় হতে পারত 'মোটরে দেখা মহিলার ঠোঁটে'র সাথে — হয়েছেও তাই, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে নয়। *রৌদ্র করোটিতে* থেকেই সচেতনভাবে কবি উপমা-চিত্রকল্পকে ভেঙে দিয়ে ভাষায় সেগুলোকে সাধারণীকরণ করেন; কবিতার অলংকার সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করেন। মৌল চিত্রকল্পকে ভেঙে দিয়ে শব্দ-ভাষায় মিশিয়ে দেয়ার এই প্রবণতা ত্রিশোত্তর কবিতার স্থাপত্যধর্মী ভাষা থেকে তাঁর ভাষাকে পৃথক করে দেয়। এই লক্ষণটিই তাঁর পরবর্তীকালের কবিতায় ব্যাপকভাবে 'ইমেজারি' সৃষ্টির প্রবণতা তৈরি করে। একইভাবে, *রৌদ্র করোটিতে*'তে শব্দের ব্যঞ্জনাময় দুরধিগম্য সত্তাকে উপেক্ষা করে কেবল বাচ্যার্থকেই অবলম্বন করেছেন — যেন বর্ণনাই কবিত্ব — কবিতা রচনা যেন একটি বাহ্যদেশীয় বিষয় — জীবন যেমন চলে কবিতাও যেন ঠিক অনুরূপ ছন্দে চলে। *রৌদ্র করোটিতে*'তে তাই শামসুর রাহমানের ভাষা প্রধানত নির্মেদ, সাবলীল, প্রত্যক্ষ ও অপ্রতিসারী। কবি প্রত্যক্ষ জগতের সত্য-মিথ্যাকে যেভাবে পর্যবেক্ষণ করেন, সেইসব দিনানুদৈনিক চিত্রকে ব্যাখ্যা করেন এবং মস্তিষ্কে সেগুলোর সমগ্রতা সাধন করেন, অবিকল সেইভাবেই কবিতায় প্রকাশ করেন ordinery speechএ। তবে, ভাষা সাধারণ এবং প্রকাশভঙ্গি অনাড়ম্বর বলে সেগুলো যন্ত্রচালিত কবিতা নয়। শব্দ-ভাষাকে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে আটপৌরে করে তোলেন — ছেঁটে দেন চিত্রকল্প-উপমা-উৎপ্রেক্ষা। যে সব 'কংক্রিট' উপমা বা উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করেন, সেগুলোও যেন বাচ্যার্থের অতিরিক্ত কোনো অনুভব না যোগায়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকেন কবি। যেমন—

ক. দাড়ি না-কামানো
মুখের মতন দিন সত্য—সত্য সবি।
('ছুঁচোর কেত্তন', *রৌদ্র করোটিতে*)

খ. সহানুভূতির মতো সবুজ সবজির প্রয়োজনে দর কষে,
রুটির মতোই জীবনকে ধ্রুব জানে
('যখন রবীন্দ্রনাথ', *রৌদ্র করোটিতে*)

গ. অলক্ষ্যে গড়িয়ে পড়ে মাছের ঝোলের মতো জোৎস্না
('আত্মহত্যার আগে', *রৌদ্র করোটিতে*)

ঘ. দেখতে চায়
বয়স্কের তোবড়ানো গালের মতন অতীতের
ধসে কয়েকটি ক্লান্ত নর্তকী ঘুঙুর নিয়ে করে
নাড়াচাড়া
('রৌদ্র করোটিতে', *রৌদ্র করোটিতে*)

চিত্রকল্পগুলোতে রহস্যের আবরণ নেই; রাজপথের মতো প্রকাশ্য। উপমাগুলো জীবনেরই অনুরূপ — কোনো বাড়তি অলংকরণের উদ্যোগ নেই কবির। মূলত, সব কালেই কবিদের মূল লক্ষ্য থাকে তাঁদের কবিতার শব্দ-ভাষার সাথে সমকালীন জন-

মানসের সমন্বিত ভাষার গভীর ঐক্য সাধন। কিন্তু, বাংলা কবিতায় ত্রিশোত্তর পর্বে জনতার ভাষার সাথে কবির ভাষার যে দুরন্বয় সাধিত হয়, শামসুর রাহমান সেই দেয়ালটিকে অপসারণ করেন এবং কেবল সমাজ-মানসের সাথে তাঁর কবিতার শব্দ-ভাষার যোগাযোগ সাধনই করেন না, বরং সেই ভাষার স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দবোধকেও কবিতার অন্তর্ভুক্ত করেন। কবিতার কিছু কৌশল, শব্দ-ভাষার কিছু অলংকার এবং মূলত প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে অবলম্বন করলেও নগর ঢাকার দিনানুদৈনিক জীবনের ওই শব্দ-ভাষা ও ছন্দই সাবলীলভাবে নির্মাণ করে কবির শব্দ-ভাষার এই নতুন চেতনাকে, প্রকাশের নতুন ধরনকে, যা বাংলা কবিতায় একান্ত রাহমানীয় বলে মেনে নিতে আর কোনো দ্বিধা থাকে না। কবি যখন সরাসরি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে একজন নাগরিক মধ্যবিত্তের কথনভঙ্গিতে বলে ওঠেন — জানি এই ভিড় ঠেলে, ঢিলে-ঢালা শস্তা সুট প'রে / রাস্তার দাম্ভিক শত বিজ্ঞাপন প'ড়ে, পুঁইশাক /ডাঁটার চচ্চড়ি,/নিরীহ মাছের ঝোলে ডুবিয়ে জীবন/ থাকব, বাঁচব আমি দিনের চিৎকারে/ রাত্রির করুণ স্তব্ধতায় ('অস্তিত্বের তন্ময় দেয়ালে', *রৌদ্র করোটিতে*), তখন সমাজ-মানসের সাথে তাঁর কবিতার ভাষা-জগতের কোনো দেয়াল থাকে না আর। এই বিশেষ রীতিই রাহমানীয় কবিতার স্বাতন্ত্র্যের মূল রহস্য।

রৌদ্র করোটিতে'তে শামসুর রাহমান সামাজিক জীবনের ভাষা ব্যবহার করে যেমন নাগরিক জীবনের উপরিতল ও সমাজ-মানসকে চিত্রিত করেন, তেমনি জটিল, সম্প্রকাশ-স্বভাবী কিছু চিত্রকল্পে দুঃস্বপ্ন-তাড়িত আধুনিক ব্যক্তি-চেতনার রূপায়ণ ঘটান। আধুনিক মানুষের অবচেতনার উল্লম্ফনকে কবি প্রকাশ করেন দুঃস্বপ্নের অনুভূতির মতোই অসম্বন্ধ টুকরো-টুকরো বাক্য জোড়া দিয়ে 'কিউবিক' পদ্ধতিতে— কবি তার নাম দেন 'খুপরির গান' —

> বমির নোংরায় ভাসে মেঝে, রুটির বাদামি টুকরো
> চড়ুই পালালো নিয়ে। তাকান না কখনো বাইরে...
> ঘরে জানালা নেই...হলুদ যেসাস বিদ্ধ কড়িকাঠে...
> রৌদ্র ঝলসিত কাক ওড়ে মত্ত রক্তে কাঠফাটা
> আত্মার প্রান্তরে। সারারাত
>
> অনিদ্রা দুঃস্বপ্ন আর
> ছারপোকা, ছিদ্রান্বেষী ইঁদুরের উৎপাত উজিয়ে
> ময়লা চাদর ছেড়ে উঠি ফের মাথাব্যাথা নিয়ে।
> ('খুপরির গান', *রৌদ্র করোটিতে*)

কবির অবচেতনের শব্দ-ভাষায় অন্যান্য অনুষঙ্গের সাথে এলেমেলোভাবে জুড়ে থাকে কালো কাক উড়ে আসা ভ্যানগঘের হলুদ গম ক্ষেত, সূর্যমুখী কিংবা জীর্ণ বুটজুতোর চিত্র, অথবা তাঁর বন্ধু গ্যঁগার আঁকা ক্রুশবিদ্ধ হলুদ যেসাসের ছবি। চিত্রকলা শামসুর রাহমানের কবিতার পরিচিত অনুষঙ্গ। বিভিন্ন পর্যায়ের কাব্যে বারবার নানাভাবে তিনি

বিভিন্ন চিত্রকলার উল্লিখন ব্যবহার করেন। কারণ, কবির মগ্ন চেতনায় সঞ্চিত থাকে 'গলির অন্ধ বেহালাবাদক, ব্র্যাকের সুস্থির মাছ, সেঁজার আপেল' ('আত্ম প্রতিকৃতি', *রৌদ্র করোটিতে*)। হিংস্র সব চিত্রকল্প কবিকে প্রহার করে তন্দ্রার ভেতর। শুভ্রতাকে ছিঁড়ে ফেলে কবির দুঃস্বপ্নে পাখা ঝাপটায় ঢাউস বাদুড়। সূর্য অপসৃত হয়ে মিলিয়ে যায় অন্ধকারে। *রৌদ্র করোটিতে*'তে কবি তাঁর দুঃস্বপ্নকে মুক্ত করেন জটিল দুর্বোধ্য, অতিপ্রাকৃত, অতীন্দ্রিয় চিত্রকল্পে — অধুনা উত্তরাধুনিক কবিরা যেমন 'হাইপাররিয়ালিটি'তে[৩] বাস্তবের অতিরেক ঘটান তাঁদের কবিতায় —

> ডানপিটে সূর্যটাও সহসা উধাও অন্ধকার
> বনে; নিশাচর চাঁদের প্রসন্ন মুখে পাখা
> ঝাপটায় ঢাউস বাদুড়, ছিঁড়ে ফেলে শুভ্রতাকে।
>
> কখনো দেখবো স্বপ্ন — কয়েকটি জলদস্যু যেন
> অবলীলাক্রমে কাটা মুণ্ডুর চামড়া নিচ্ছে তুলে
> অব্যর্থ ছোরার হিংস্রতায়, গড়ায় মদের পিপে
> রক্তিমবালিতে আর বর্বর উল্লাসে চতুর্দিকে
> কম্পিত পাতার মতো শব্দের ধমকে। কখনোবা
> হঠাৎ দেখব জেগে শুয়ে আছি হাত-পা ছড়ানো
> বিকেলের সাথে নামহীন কবরের হলদে ঘাসে,
> দেখব অঢেল রৌদ্র ঝলসে উঠে ঝরায় চুম্বন
> ওষ্ঠহীন করোটিতে।
> ('রৌদ্র করোটিতে', *রৌদ্র করোটিতে*)

রৌদ্র করোটিতে'তে শামসুর রাহমান একদিকে 'মডার্নিস্ট' কবিদের ভাষার সচেতন অলংকরণ, স্থাপত্যধর্মিতা, কৃত্রিম দুরূহতা, জনসংযোগবিচ্ছিন্ন আত্মময় অহংচেতনার বৈশিষ্ট্যগুলো সচেতনভাবে এড়িয়ে গেছেন এবং সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞানকে ধারণ করে কবিতাকে করে তুলেছেন যথাসম্ভব 'অবজেক্টিভ', অপরদিকে নিজের চেতন-অবচেতনের দুরূহ, জটিল চিত্রমালাকে ব্যক্ত করতে কখনো-কখনো অবলম্বন করেছেন অসম্ভব-চিত্রকল্পের কল্পিত জগৎ সৃষ্টির স্বাধীনতাকেও। অবচেতনার সন্ত্রাসকে কবি তাঁর বিভিন্ন কাব্যে নানা মাধ্যমে — কখনো পরাবাস্তবতায়, কখনো স্বপ্নকল্পচিত্রে (ড্রিম ইমেজারি), স্বয়ংক্রিয় লেখনীতে (অটোমেটিক রাইটিং), অতিবাস্তব চিত্রকল্পে, গূঢ় প্রতীকে, চিত্রকলার কলাকৌশলে কিংবা সাধারণ চিত্রকল্পে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু, অবচেতনকে প্রকাশের এই প্রতীতি শামসুর রাহমানের যেমনই হোক, তাঁকে বলা যায় না বিশুদ্ধ পরাবাস্তববাদী কিংবা প্রতীকবাদীদের তন্নিষ্ঠ উত্তরপুরুষ, কিংবা উত্তরাধুনিক বিশ্বাসের ধারক। তাঁর কবিতার পরাবাস্তবতা বাস্তবের সাথে মেশা, অমিশ্র প্রতীকায়ন তাঁর স্বভাব নয়, তাঁর কবিতার অতিবাস্তব চিত্রকল্পগুলো বাস্তবতাবর্জিত নয়। *রৌদ্র করোটিতে*'র এই কবিতাটিও তেমনি কবির নিজত্বে গড়া একটি মিশ্র স্বভাবের কবিতা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বোদলেয়ার, র‍্যাঁবো প্রমুখ প্রতীকবাদী কবিরা 'সিনাসথেসিয়া'র প্রয়োগে, বিস্তৃত প্রতীকায়ন কৌশলে কবিতায় এক ধরনের 'ইল্যুশন' বা বিভ্রম তৈরি করতেন। কবিতার দৃশ্যপটে ইন্দ্রিয়গত রূপান্তর ঘটাতেন — বর্ণকে সুরে বা সুরকে বর্ণে রূপান্তর করে একটির পর একটি দৃশ্যকল্পে চেতনাকে সচল করে কবিতাকে তুরীয় করে তুলতেন (জাহাঙ্গীর, ১৯৮৮ : ৮)। *রৌদ্র করোটিতে*'র একটি অসাধারণ কবিতায় শামসুর রাহমান প্রতীকবাদী কবিদের মতো সুরকে সৌরভের ন্যায় ছড়িয়ে দেন নাগরিক ব্যস্ততায়, ক্লেদে-ক্লিন্নতায়-স্নিগ্ধতায়, জড় ও জীবে, এমনকি 'কুষ্ঠরোগীর ক্ষতের পিছল রসে'। 'দুপুরে মাউথ অর্গান' কবিতায় এক উন্মত্ত বালকের মাউথ অর্গানের সুর ছড়িয়ে যায় নগরীর দালানে, এভিন্যুয়ের ফুটপাতে, ব্যস্ত রাস্তায়, সাধারণ মানুষের মগজের কোষে-কোষে। ট্রাফিক চমকে তাকায়, গাড়িগুলো হরিণের মতো থেমে উৎকীর্ণ হয়, বালকটিও উধাও হয় কিন্তু মাউথ অর্গানের সুর ঝংকৃত হয় বাতাসে। সে সুর ছড়িয়ে পড়ে 'ত্রিতল দালানে', 'রং মাখা ক্লান্ত ঠোঁটে', নিঃশেষিত ফলের ঝুড়িতে, 'বিট পুলিশের নিষ্প্রাণ শাদায়', 'মোটরের মসৃণ শরীরে', ব্যাংকের দেয়ালে, পরিত্যক্ত বাদামের খোসায়, পকেটমারের ক্ষিপ্র আঙ্গুলে, গুণ্ডার টেরিতে, ফেরিওয়ালার কণ্ঠে এবং অবশেষে 'কুষ্ঠ রোগীর ক্ষতের পিছল রসে'। সুর যেন স্বয়ংক্রিয় হয়ে সঞ্চারিত হয় এইসব সজীব, নির্জীব কিংবা যন্ত্রচালিত অনুষঙ্গে —

> কুষ্ঠরোগী দ্যাখে তারও ক্ষতের পিছল রসে ঝরে
> মত্ত বালকের অর্গানের সুর : ভাবে এই সুর
> পারে না গড়াতে তার গলিত শরীরে ভাঁজে ভাঁজে
> আবার নতুন মাংস শিল্পের অলীক রসায়নে?
> হতে কি পারে না তার বিনষ্ট শরীর ওই দূর
> আকাশের পাখিদের মতো ফের সহজ সুন্দর?
> ('দুপুরে মাউথ অর্গান', *রৌদ্র করোটিতে*)

এ কবিতায় সুরের সাথে-সাথে কবি তাঁর ইন্দ্রিয়কে বিস্তৃত ও প্রবহমান করে তোলেন যদিও প্রতীকবাদীদের মতো সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়ের রূপান্তর ঘটান না। *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* কাব্যের 'সেই ঘোড়াটি' কবিতায় দৃশ্যপট যেমনভাবে রূপান্তরিত হয় — আস্তাবলের নর্দমা পরিণত হয় অপরূপ সরোবরে, থ্যাঁতলানো ইঁদুর রূপান্তরিত হয় ফুলের তোড়া আর মণিরত্নে এবং বেতো ঘোড়াটা অক্ষত দেহে উড়ে যায় নক্ষত্রপুঞ্জে, এ কবিতায় তেমন সম্পূর্ণ রূপান্তর সাধন করেননি কবি — বস্তু-সত্তাকে উন্নীত করেননি কোনো ইন্দ্রিয়ময় সত্তায়। শুধু মাউথ অর্গানের সুরে-সুরে কুষ্ঠ রোগীর মনে তার অবলুপ্ত কান্তি ফিরে পাবার বাসনাকে জাগ্রত করেন। কবি এ কবিতার প্রতীকায়নে বাস্তবের সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটান না, কারণ, বাস্তবকে কোনো সুন্দর বিভ্রমে পরিণত করার পরিকল্পনা এ কাব্যে অন্তত কবির নেই — বাস্তবকে বাস্তবের মতো করে উপস্থাপন করাই তাঁর লক্ষ্য।

শামসুর রাহমান মুক্তক মাত্রবৃত্ত, প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত ছাড়াও 'রৌদ্র করোটিতে'তে সমমাত্রিক পর্বের ছন্দে কিছু কবিতা লিখেছেন। সমিল মাত্রাবৃত্ত ছন্দে ছড়ার মতো এই কবিতাগুলোতে কবি চারপাশের নানা অসঙ্গতিকে রূপান্বিত করেছেন লঘু মাত্রায়। রূপক, প্রতীক, ব্যাজস্তুতিতে কবিতাগুলোর ভাষা ব্যঙ্গপ্রবণ ও আয়রনি-প্রবল। যেমন :

> ভালুকের কড়া দাপটে ঈগল
> ক্ষুব্ধ চিত্তে ঝাপটায় ডানা,
> সামনে সামনে কোলাকুলি তাই
> বিমূঢ় সিংহ খাচ্ছে বিষম।
> ('নরমুণ্ডের নৃত্যে', *রৌদ্র করোটিতে*)

এইসব অসঙ্গতির ভেতর নিজের জৈবিক আনুগত্য ও দাসত্ব নিয়ে বেঁচে থাকা মধ্যবিত্ত কবি 'মেষে'র প্রতিরূপকে নিজেই নিজেকে উপহাস করেন 'মেষতন্ত্র' কবিতায়। চারপাশের অসঙ্গতিকে রূপক, প্রতীক, ব্যাজস্তুতি, ব্যঙ্গ, আয়রনি দিয়ে উপস্থাপনের এই পার্শ্ব-স্বভাবটি *রৌদ্র করোটিতে*'র অব্যবহিত পরের কাব্যগুলোতে আরো গভীর ও প্রকটরূপে উপস্থাপিত হয় রূপক ও প্রতীকায়নের নানা নিরীক্ষায়।

ষাটের দশক ছিল শামসুর রাহমানের আত্মপ্রতিষ্ঠার কাল এবং সেই সাথে নিজেকে চেনার সময়। *রৌদ্র করোটিতে*র সূত্রে আত্মময় বিষাদচেতনার বিবর ভেঙে রৌদ্রালোকে জনচৈতন্যের সাথে সম্মিলন ঘটে কবির । ফলে, ভাব ও নান্দনিকতার সমান্তর সাধনে উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে *রৌদ্র করোটিতে*র প্রাঙ্গণ। কবিতার শব্দ-ভাষা ও ছন্দকে কাল ও প্রতিবেশের কণ্ঠস্বরের সাথে এমন নিখুঁতভাবে সমস্বরিক করে তোলার দৃষ্টান্ত *রৌদ্রকরোটিতে* ছাড়া এমনকি কবির অন্য কোনো কাব্যেও দুর্লক্ষ। শামসুর রাহমানের কবিতার নান্দনিকতায় তাঁর মনন, শ্রম ও শিল্পী-সত্তার স্বাক্ষর তীব্র। দেশ-কাল সচেতন, কবিতার বৈশ্বিক নান্দনিকতায় অভিযোজিত, প্রতিনিয়ত শিল্প-সন্ধিৎসু, স্বয়ম্প্রকাশে আত্মবিশ্বাসী কবি শামসুর রাহমান বাংলাদেশের কবিতার নান্দনিক আত্মতা প্রতিষ্ঠায় ও তার উৎকর্ষ সাধনে অন্যতম রূপকার — অনুজ কবিদের পথিকৃৎরূপে স্বীকৃত। কালান্তরের বাংলা কবিতায় তাঁর কবিকৃতির ইতিহাস কালপুরুষের মর্যাদায় চির-অনির্বাণ হয়ে থাকার প্রত্যাশা রাখে।

টীকা

১. What can be said to characterize the Outsider is a sence of strangeness, or unreality ... the outsider is a man who cannot live in the comfortable, insulted world of the bourgeois, accepting what he sees and touches as reality. 'He sees too deep and too much', and what he sees is essentially *chaos*...The Outsider is a man who has awakened to chaos. He may have no reason to beleive that chaos is positive, the germ of life ... inspite of this, truth must be told, chaos must be faced. (Wilson, 1963: 13-14)

২. No! I am not Prince Hamlet, nor was meant to be;
Am an attendant lord, one that will do
To swell a progress, start a scene or two,
Advise the prince; no doubt, an easy tool,
Deferential, glad to be of use,
Politic, cautious, and meticulous;
Full of high sentence, but a bit obtuse;
At times, indeed, almost ridiculous—
Almost, at times, the Fool.
প্রুফ্রকের উদ্ধৃত সংলাপে কবি স্বয়ং অনুপ্রবিষ্ট। (Eliot, 1936 : 7)

৩. জাঁ বদ্রিলা কথিত 'হাইপাররিয়ালিটি' বা প্রতিরূপ বিভ্রান্তি (simulacra) হলো কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে সঙ্গতি হারানো আধুনিক মানুষের এক অসুখ, যা প্রতিনিয়ত বাস্তবের নানা প্রতিরূপজনিত ধাঁধাঁ থেকে জন্ম নেয়। উত্তরাধুনিক কবিরা পরাবাস্তবতাকে ভেঙে দিয়ে এইরূপ বহির্বাস্তবতা সৃষ্টির মাধ্যমে কবিতায় স্বপ্নের আধিদৈবিক, পৈশাচিক কিংবা অনৈসর্গিক জগৎকে ভাষারূপ দেন (Baudrillard, 1983: 142)

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

আকতার কামাল, বেগম, ২০১৪। *শামসুর রাহমানের কবিতা : অভিজ্ঞান ও সংবেদ*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

জাহাঙ্গীর তারেক, ১৯৮৮। *প্রতীকবাদী সাহিত্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

ভূইয়া ইকবাল, ২০০৬। "শামসুর রাহমানের শহর", সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম সম্পাদিত, *নির্জনতা থেকে জনারণ্যে : শামসুর রাহমান*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

ভূইয়া ইকবাল, ২০০৬। "শামসুর রাহমান রচনাবলি : ভূমিকা", খান সারওয়ার মুরশিদ সম্পাদিত, *নির্জনতা থেকে জনারণ্যে : শামসুর রাহমান*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

শামসুর রাহমান, ১৯৯১। "পূর্ববাঙলার সাম্প্রতিক কবিতা", *মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা*, ষষ্ঠ বর্ষ : তৃতীয় সংখ্যা, উবিনীগ, পৃ. ২৭৪-২৮১।

শামসুর রাহমান, ১৯৯১। "শামসুর রাহমানের মুখোমুখি" [সাক্ষাৎকার. হুমায়ুন আজাদ] *মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা*, শামসুর রাহমান সংখ্যা, ষষ্ঠ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, উবিনীগ, পৃ. ১০৬-১৩৪।

শামসুর রাহমান, ২০০৭। *কালের ধুলোয় লেখা*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা।

Baudrillard, Jean, 1983. *The Precession of Simulacra* [Trans. Paul Foss, Paul Patton and Philip Beitehman], Semiotertce, U.S.A.

Eliot, T.S. 1936. *Collected Poems 1909-1962*, Harcourt, Brace & World, Inc. New York.

Pound, Ezra, 1966. *A Retrospect, Poets On Poetry* [ed. Norman Charles] The Free Press, New York, P. 320-333.

Riley Denise [ed.] 1992. *Poets on Writing*, Macmillan Academic and Provessional LTD, London.

Thomas, Dylan, 1972. *Collected Poems 1934-1952, Everyman's Library*, London.

Wilson, Colin, 1982. *The Outsider*, foreword by Marlyn Ferguson, Penguin Putnam inc., New York.